একটি স্বতন্ত্র ও সৎ প্রয়াস জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘অশ্রুমতী’

ডঃ তৌহিদ হোসেন[2]

সিপাহী বিদ্রোহের পর কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়, ছোট-বড় কিছু চাকরি, ব্যক্তিগত আইনে গোরাদের সমান মর্যাদা ইত্যাদির পাশাপাশি আরেকটি জিনিস আমরা পাই। মহারানির কৃপায় সে –জিনিসটির নাম হিন্দু জাতীয়তাবাদ। বাংলা সাহিত্যে এর আদি উদগাতা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯) একদিকে যেমন লিখেছিলেন ‘কতরূপ স্নেহ করি ,দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া’, তেমনি সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাঁর কলম থেকেই বেরিয়েছিল-----

ভারতের প্রিয় পুত্র হিন্দু সমুদয়।
মুক্তমুখে বল সবে ব্রিটিশের জয়॥

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে , আমাদের তখনকার জাতীয়তাবাদী প্রয়াস থেকে এই নবোপার্জিত আর্য অভিমানকে বাদ দেবার জো নেই। এরই ফলশ্রুতি বিদ্রোহ - পরবর্তী প্রায় পঞ্চাশ বছরের বাংলা সাহিত্য – অন্তত ইতিহাসাশ্রিত রচনাগুলো। কারণ ইংরেজ-বিরোধী জাতীয়তাবাদ প্রচার করার মতো বুকের পাটা বা সাবালকত্ব তখনও পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যিকরা অর্জন করতে পারেননি। তার ফল হল কী , রাণা প্রতাপসিংহ, শিবাজী, এমনকি অখ্যাত রাজসিংহ, ভীমসিংহ যেমন জাতীয় বীর রূপে পূজা পেলেন, তেমনি ভিলেন হয়ে গেলেন সম্রাট ঔরঙ্গজেব, আলাউদ্দিন প্রমূখ। তখন রানা প্রতাপকে নিয়ে লেখার সময় কেউ ভাবতেই পারেননি যে, তাঁর সৈন্যদলের এক বিরাট অংশ ছিল হাকিম খান শূর –এর নেতৃত্বে। প্রতাপেরও আগে তাঁর পিতৃদেব রাণা উদয় সিংহ যখন ভয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে পালিয়ে যান, তখন চিতোর দূর্গ রক্ষার ভার পড়ে প্রধান গোলান্দাজ ইসমাইল খানের উপর, যিনি আকবরের গুলিতে প্রাণ দেন। যাক, এ পর্যন্ত তবু না হয় ঠিক আছে –অন্তত নবোদ্ভূত জাতীয়তাবাদের বালসুলভ আদ্যিখ্যেতা বলে একে মেনে নেওয়া যায়।কিন্তু এর সঙ্গে উপজাত হিসেবে আরও কিছু এসেছিল—ধারাবাহিকভাবে একটার পর একটা রচনায় মুসলিম চরিত্রগুলোকে নৈতিক অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমায় দেখানো।

এই পরিপ্রেক্ষিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪৯-১৯২৫) ‘অশ্রুমতী’ (১৮৭৯) নাটকটির দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে মনে হবে, গুমোটের মধ্যে খানিক টাটকা বাতাস। কী আছে নাটকটিতে ?

---

[2] Assistant Prof., Naba Barrackpur Prafulla Chandra Mahavidyalaya, Kolkata, W.B.

আছে পাশাপাশি দুটি বিষয়ঃ এক দিকে রাণা প্রতাপসিংহের স্বদেশপ্রীতি ও আত্মত্যাগ, অন্যদিকে তাঁর কন্যা অশ্রুমতীর সঙ্গে শাহজাদা সেলিমের প্রেম । অর্থাৎ এই নাটকের মাধ্যমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথও স্বদেশপ্রীতির মাহাত্ম্য প্রচার করতে চেয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে অকারণে মুসলিম বিদ্বেষ প্রচার করেননি। বরং স্বদেশপ্রীতির পরিপূরকরূপে এঁকেছেন প্রেমের মাধ্যমে ধর্মীয় বিভেদের প্রাচীর অতিক্রমণের চিত্র । লেখকের এই উদারতার জন্যই বাংলা ইতিহাসকল্প রচনার ধারায় 'অশ্রুমতী' অনন্য। আর তা কতখানি বৈপ্লবিক তার প্রমাণ আমরা পাই লেখকের বিরুদ্ধে তৎকালীন হিন্দু সমাজের একাংশের প্রতিক্রিয়ায়। যেমন – বড়বাজার লাইব্রেরির সম্পাদক পন্ডিত কেশবপ্রসাদ মিশ্র নাট্যকারকে লেখেন :

"Myself and several prominent members of the library have carefully gone through your book entitled 'Asrumati ' and find therein, to our great astonishment, that maharana Pratap Sing, the greatest of hindu sovereigns, had a daughter in the person of Asrumati, who deeply fell in love with a Mahamedan prince. Would you please let us know the source from which you have got your information in connection with it." [মন্মথনাথ ঘোষ : 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ']

সত্য বটে , অশ্রুমতী নামটি কাল্পনিক এবং তাঁর সঙ্গে সেলিমের প্রণয়কাহিনিও কল্পিত রোমান্স। কিন্তু একই কাজ তো এর আগে করেন 'জ্ঞানে উদার সূক্ষদর্শী দার্শনিক' ভূদেব মূখ্যোপাধ্যায় তাঁর 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' (১৮৫৭) বা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী'তে (১৮৬৫) । কই, তখন তো কেউ প্রশ্ন তোলেন নি। বরং প্রশ্ন উঠলে ওইসব ক্ষেত্রেই বেশি সঙ্গত হত। কেননা কেউ কোন দিন শোনেনি যে কোন মুঘল শাহাজাদী শিবাজির সঙ্গে আংটি বদল করেছে৷ গল্পের গোরু গাছে উঠলেও তো গোরুই থাকবে না কি? অথচ অন্য দিকে তাকালেই আমরা দেখব , একের –পর –এক মুঘল সম্রাট শাহজাদার সঙ্গে রাজপুতকন্যার বিয়ে হচ্ছে , আর সেজন্য কোথাও কোন হেলদোল নেই। রাজপুতনার ইতিহাসে এই প্রবণতার বিরূদ্ধে কোনো সামাজিক বিক্ষোভের নির্দশন নেই। যাক সে কথা। 'অশ্রুমতী' র বিরূদ্ধে প্রতিক্রিয়া ভয়ংকর হয়ে হঠে হিন্দি বলয়ে। 'অশ্রুমতী'র হিন্দি সংস্করেণর প্রকাশক বেনারসের রামকৃষ্ণ বর্মা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে জানান(১৯০১): 'আপনার রচিত 'অশ্রুমতী' নাটক আমি নিজ খরচে ছাপাইয়া ছিলাম, কিন্তু কতিপয় পত্রে উহার কূৎসা রটাইয়া আমাকে বাধিত করিল যে ভবিষ্যতে যেন আর বিক্রয় না করি। তন্নিমিত্ত আমাকে প্রতুল অর্থহানি সহ্য করিতে হইয়াছে'। [মন্মথনাথ ঘোষ : 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ']

তার উপরে, রাজস্থানের ক্ষত্রিয় সভা যার সদস্য ছিলেন রাজস্থানের সব করদ নৃপতি, সরাসরি 'অশ্রুমতী'র বিরুদ্ধে নেমে পড়ে। সেখানে শুরু হয় বাঙালি – বিরোধী আন্দোলন। অবস্থা এতদূর

গড়ায় যে, সেকালের বিশিষ্ট সাংবাদিক, গোঁড়া হিন্দুত্বের প্রচারক শশধর তর্কচূড়ামণির সহযোগী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৬ - ১৯২৩) জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন একটি চিঠি লিখে উদয়পুরের তৎকালীন মহারানা ফতেহ সিংহ বাহাদুরের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য। পাঁচকড়িবাবুর পত্রটির কিছু অংশ এরকম :

"সত্য বটে, নাটকের হিসাবে 'অশ্রুমতী'তে কোন দোষ নাই, সত্য বটে নাট্যকারের সকল দেশেই যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে, সে স্বাধীনতার আপনি কোথাও অপব্যয় করেন নাই, তথাপি যখন একটা অছিলা ধরিয়া দুষ্ট হিন্দুস্থানী লেখকগণ বাঙ্গালী জাতির প্রতি বিষম বিদ্বেষের উদগার করিতেছে, তখন একটু সাবধান হইলে, একটু নরম হইলে বাঙ্গালীরই পক্ষে শ্লাঘার কথা হইবে, জানিবেন।... একখানি চিঠিতে সৌজন্য ও শিষ্টাচারের ভাষায় রাণা প্রতাপবংশাবতংস বর্তমান মহারাণা ফতেহ সিংহ মহোদয়ের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিতে বোধ হয় আপনার সঙ্কোচ বোধ হইবে না।বিশেষ যখন এইরূপ করিলে একটি প্রবল জাতি সম্প্রদায়ের anour propre – র পুষ্টি হইবে এবং বাঙ্গালী জাতির সদ্ভাবের সূচনা করা হইবে, তখন আপনার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি এ ব্যাপারে সঙ্কোচ করিতেই পারেন না।" [মন্মথনাথ ঘোষ : 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ']

ভাবুন ব্যাপারটা। জোর যার মুলুক তার। ইংরেজের পদলেহন করে ফতেহ সিংহরা His Highness বলে তাঁদের ভয়ে বাঙালি জাতির শুভাকাঙ্ক্ষীরা ভীত। কিন্তু এমন প্রশ্ন বা অনুরোধ তো জেবউন্নিসাকে কলংকিত করার (রাজসিংহ) বেলায় ওঠেনি, যে জেবউন্নিসা শুধু শাহজাদী বলেই নন, নিজস্ব কবিত্ব ও পান্ডিত্যের জোরেই ভারতের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারী। আসলে, তখন ভয় দেখানোর মতো আর ছিলেনই-বা কে ? সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর তো আর ইংরেজের পদরেণুর আলোয় উদ্ভাসিত হতে চাননি – তাঁর অস্থিমজ্জা ততদিনে সুদূর রেঙ্গুনের মাটিতে বিলীন হয়ে গেছে।

যাই হোক, আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের সৌভাগ্য, জোতিরিন্দ্রনাথ এসব দাবি – হুমকির কাছে মাথা নত করেন নি। যদিও ফতেহ সিংহের কাছে চিঠি লিখে বিনীতভাবে নিজের মতামত পেশ করেছেন, এবং 'অশ্রুমতী'র অষ্টম সংস্করণে (১৯২০) একটি 'কৈফিয়ৎ' জুড়ে দিয়েছেন; কিন্তু কোনোভাবেই মূল রচনার কোনো অংশের পরিবর্তন – পরিমার্জন করেন নি।

জোতিরিন্দ্রনাথের এই সৎসাহস ও উদারতার উৎস কোথায় ? এর উত্তর খুঁজতে হবে তার জীবনসাধনায়। 'রবিজীবনী' র রচয়িতা প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন : 'বাংলার শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে নাট্যকার – সুরকার – অনুবাদক – শিল্প ও আরও বহু কর্মযজ্ঞের হোতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জনমানসে স্মৃতি ও বিস্মৃতির জন্য অনেকটা দায়ী তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা

রবীন্দ্রনাথ, এমন কথা বললে অনেকে আহত হবেন, কিন্তু কথাটা সত্যি।' ['পরিচয়', বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি']

রবীন্দ্রনাথের দোষ কতটা তা বিচার করার ধৃষ্টতা আমার নেই, কিন্তু সত্য যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আজ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অনতি উজ্জ্বল নাম মাত্র। অথচ 'বিচিত্রকর্মা' বিশেষণটি তাঁর মতো করে খুব কম বাঙালি মনীষীকেই মানায়। বাস্তবিক তিনি 'বহু কর্মযজ্ঞের হোতা'। ছেলেবেলা থেকেই তিনি 'কেজো' টাইপের ছিলেন। তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে আছে : 'কল্পনাকে জুড়াইতে না দিয়া তৎক্ষনাৎ তাকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইতাম। তা সে ছেলেমানুষিই হউক আর যা – ই হউক।'

এই মানসিকতার জন্য মানুষটির কথা ও কাজে কোনো ফারাক ছিল না। নবজাগরণের নির্যাসিত সত্যকে, অন্তত তিনি যে রকম বুঝেছিলেন, জীবনে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে গেছেন। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'সঞ্জীবনী সভা', যার উদ্দেশ্য ছিল 'ভারতবর্ষের সার্বজাতিক ঐক্যসাধন'। তাঁর অন্যান্য ভাইদের মত তিনি চাষীদের বুকের উপর দাঁড়িয়ে জাতীয় জাগরণের মন্ত্র উচ্চারণ করেন নি , চেয়েছিলেন স্বদেশী শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে দেশের উন্নতি। দেশি দেশলাই ও কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা, পাটের ব্যবসা, নীলের ব্যবসা , জাহাজের ব্যবসা ইত্যাদি তাঁর উদ্যোগের নির্দশন। যদিও শেষ পর্যন্ত সবই ব্যর্থ হয়েছিল , কিন্তু এর পেছনে যে আন্তরিক ও মহৎ প্রয়াস নিহিত তা ভুলে গেলে অন্যায় হবে। মুক্তিমন্ত্রকে তিনি রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন নিজের পারিবারিক জীবনেও। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'র পাঠকরা ভালোভাবেই জানেন, বিশ্বকবির হয়ে ওঠার পেছনে এই ব্যক্তিটির অবদান কতখানি। কী না দিয়েছেন তিনি রবীন্দ্রনাথকে। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই তাঁর আচরণ ছিল বন্ধুর মতো , দাদাগিরির লেশমাত্র ছিলনা। আর আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, তাঁর বিখ্যাত ছোটো ভাইয়ের মতো তিনি কথায় বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করে বাস্তবে অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেবার মতো কাজ করেন নি। অবশ্য মানুষটি ছিলেন নিঃসন্তান। স্ত্রী কাদম্বরী দেবীও আত্মহত্যা করেন যৌবনের মধ্যবেলায়। কিন্তু ওই অল্প সময়ের মধ্যেই স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর যে আচরণ তা সেকালের বিচারে নজিরবিহীন। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'জীবনস্মৃতি'র একটি অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য :

"স্ত্রী স্বাধীনতার শেষে আমি এত বড়ো পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম যে , গঙ্গার ধারের কোনও বাগানবাড়িতে সস্ত্রীক অবস্থানকালে আমার স্ত্রীকে আমি নিজেই অশ্বারোহণ পর্যন্ত শিখাইতাম। তাহার পর জোড়াসাঁকো বাড়িতে আসিয়া দুইটি আরব ঘোড়ায় দুইজনে পাশাপাশি চড়িয়া বাড়ি হইতে গড়ের মাঠ পর্যন্ত প্রত্যহ বেড়াইতে যাইতাম। ময়দানে পৌঁছিয়া দুইজনে সবেগে ঘোড়া ছুটাইতাম। প্রতিবেশীরা স্তম্ভিত হইয়া গালে হাত দিত। রাস্তার লোকেরা কৌতূহলে ও বিস্ময়ে মুখ ব্যাদান করিয়া

চাহিয়া হতভম্ভ হইয়া থাকিত। দারোয়ানেরা আমাদের পানে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিত। সে সব দিকে আমার ভ্রূক্ষেপও ছিল না। আমি তখন উদ্দাম নব্যভাবের নেশায় উন্মত্ত !"

তাঁর 'অশ্রুমতী' উপরোক্ত ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন। তিনি নিজেও বলেছেন : 'হিন্দুমেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত --- কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম , নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তন করিলে হয়তো কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে'। [বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় : 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি']

শেষ করার আগে লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই যে , এই 'ঐতিহাসিক বীরত্ব গাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী 'কীর্তনের সময় তিনি মুসলমানদের বাঁকা চোখে দেখেন নি । ভুলে যান নি যে মুসলমানরাও ভারতীয় সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাঁর মতো করে ভূদেববাবু - বঙ্কিমবাবুরা যদি ভাবতেন, তাহলে বিশ শতকের সূচনায় মতীয়র রহমান খান বা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীরা প্রতিক্রিয়াজাত উপন্যাস লেখার সুযোগ পেতেন না । আর তারপর অন্নদাশঙ্কর রায় মশাইকেও লিখতে হত না 'খোকা ও খুকু' নামের অনিবার্য ছড়াটি।

<u>নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী</u>

১. 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকসমগ্র' (প্রথম খন্ড), সম্পাদনাঃ দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা – ৯ , জানুয়ারি- ২০০২

২. 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি' , বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, প্রশান্তকুমার পাল সম্পাদিত, সুর্বণরেখা , কলকাতা-৯, ২০০২

৩. জীবনস্মৃতিঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা – ১৭, ভাদ্র ১৪১১

৪. রবিজীবনীঃ প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড , কলকাতা – ৯ , ১ম খন্ড – আষাঢ় ১৪১৭, দ্বিতীয় খন্ড – এপ্রিল ২০০৯, তৃতীয় খন্ড –চৈত্র ১৪১৯

৫. 'নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমনী' , গোলাম মুরশিদ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা -৬ জানুয়ারি ২০০১

৬. 'সাময়িকী', দ্বিতীয় খন্ড, সম্পাদকঃ প্রদীপ বসু , আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা—৯, এপ্রিল ২০০৯